নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৮, পৃঃ ৮৩-৯৬
© ২০১৩ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ শিশুর বাস্তবতা অনুধাবনে উন্নয়ন সংস্থাসমূহের টানাপোড়েন[১]

মোঃ ইব্রাহীম খালেদ[*], মাকসুদা খানম[**]

১. ভূমিকা

বর্তমান উন্নয়ন ডিসকোর্সে শিশু একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্যাটাগরি হিসেবে অবস্থান করছে; যেখানে মনে করা হয় শিশু সমাজকাঠামোতে একটি নাজুক গ্রুপ হিসেবে বিরাজ করে। এই নাজুকতা ভেঙ্গে শিশুকে সমাজের অন্যান্য মানুষের মত সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্যই শিশুর উন্নয়নের ধারণাটি সামনে আসে। এক্ষেত্রে শিশুর উন্নয়নের জন্য তার অধিকারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে অধিকারের এই বোঝবুঝি পূর্বের অধিকারের বোঝবুঝি হতে মূলগতভাবে ভিন্ন। বর্তমানে অধিকার হয়ে গেছে একটি পণ্য, যার এটি নেই তাকে তা দিতে হবে (আখতার, ২০০৭)[২]। এই প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন ডিসকোর্সে যে শিশুর অধিকারের কথা বলা হয় তা হচ্ছে বৈশ্বিক শিশু অধিকার; যেখানে মনে করা হয় অন্যান্য বয়স্ক মানুষের মতো শিশুরও অধিকার রয়েছে। বৈশ্বিক শিশু অধিকারের এই ধারণা তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করেছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তাবিত এই সনদে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেছে। আমরা যদি এই সনদটি একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে এই সনদের একটি রাজনৈতিক এজেন্ডা রয়েছে (আখতার, ২০০৭)। এটি পৃথিবীর সকল শিশুর বাস্তবতাকে একই রকম ধরে নেয়ার মধ্য দিয়ে পশ্চিমা আদর্শবাদী মডেল ছড়িয়ে দিতে চাইছে। একই সাথে এই সনদ উন্নয়ন সংস্থা সমূহের জন্য শিশুকে কেন্দ্র করে নানা উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করার একটি পরিসরও তৈরি করে দিচ্ছে।

পশ্চিমা এই আদর্শবাদী মডেল দিয়ে বাংলাদেশে যখন উন্নয়ন সংস্থাসমূহ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে তখন তাদের মধ্যে একটি টানাপোড়েন তৈরি হয়। এই টানাপোড়েন তৈরি হওয়ার কারণ বৈশ্বিক যে শিশুর অধিকারের কথা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বলছে তার সাথে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক শিশুরই বাস্তবতা মেলে না। জাতিসংঘ শিশু অধিকার

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: mik0009@hotmail.com
** প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ইমেইল: maksuda.shetu@yahoo.com

সনদে শিশুকে স্বতন্ত্র সামাজিক ক্যাটাগরি হিসেবে ধরে তার উন্নয়নের কথা বলা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় শিশুকে তার পরিবার ও সমাজ থেকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। শিশুকে তার প্রেক্ষাপট (সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক) থেকে আলাদা করে দেখার কারণে উন্নয়ন সংস্থাসমূহের পদক্ষেপগুলো অকার্যকর, অদ্ভুত ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। ফলে দেখা যায় মাঠ পর্যায়ের অনেক এন.জি.ও কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে স্থানিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ আবার তার দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছুটা পরিবর্তন করে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করে। এরকমই একটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে শিশুকে স্বতন্ত্র সামাজিক ক্যাটাগরি হিসেবে না দেখে তাকে পরিবার, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবেচনা করার কথা বলা হয়। কিন্তু দেখা যায়, পরিবারকেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুকে সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবেচনা করার কথা বললেও আদতে তা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের এজেন্ডাই বাস্তবায়ণ করে চলে। অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর ভিন্নতা কেবল নামকরণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তবতায় দেখা মেলে না। দেখা যায় উন্নয়ন সংস্থার কর্মীদের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য এই নতুন পন্থার কথা বলা হয় কিন্তু যখন রিপোর্ট লেখা হয় তখন শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির মতো শিশুকে স্বতন্ত্র সামাজিক ক্যাটাগরি হিসেবে ধরে রিপোর্ট লেখা হয়। কেননা স্থানিক ভাবে শিশুর বাস্তবতা যে ভিন্ন তা বৈশ্বিক ভাবে খুব একটা গ্রহনযোগ্যতা পায় না। স্থানিক এই উন্নয়ন সংস্থাসমূহ বৈশ্বিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের অর্থায়নে পরিচালিত হয়। তাই এখানে বৈশ্বিক ধারণাই অগ্রজ হিসেবে থেকে যায়।

স্থানিক উন্নয়ন সংস্থার এই টানাপোড়েন বোঝার জন্য ভূমিকা ও উপসংহার বাদে এই আলোচনাটিকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও এর সংকটসমূহের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে উক্ত সংকট নিরসনে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গৃহিত পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ অংশে এই পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও যে উন্নয়ন এজেন্সির মাঝে টানাপোড়েন তৈরি করে তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২.অধিকার থেকে শিশু অধিকার ঃ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অধিকার বলতে সাধারনতঃ ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাধীনতা ও ক্ষমতার মোকাবেলাকে বোঝানো হয়ে থাকে (Theis, 2004)। অধিকার প্রত্যয়টির ইতিহাস খেয়াল করলে দেখা যায় যে প্রথম দিকে বিভিন্ন সংগ্রাম ও আন্দোলনে অধিকারের ধারণা ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকারের ধারণা যুক্ত হয়ে পড়ে। ৯০ এর দশকে এসে অধিকারকে উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনেক বিষয় অধিকার ধারণায়নে সম্পৃক্ত হয়। Mamdani (1996) & Kabeer (2002) দেখান যে উপনিবেশ বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অধিকারের কথাবার্তা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সামনে আসতো। এটা যে কেবল উপনিবেশ থেকে বের হওয়ার জন্য তা নয়, ভাল জীবনযাপনের কথাও অধিকারের ধারণায় কাজ করতো। এ সময় অধিকার বলতে এমন কিছু বোঝানো হতো যা

শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অর্জন করতে হবে। Manji (1998) দেখান যে আফ্রিকাতে যে মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল তা ছিল স্থানীয় মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। আবার সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্যও অধিকার আদায়ের আন্দোলন হয়েছে। যেমন কেনিয়ায় *Kakuyu* নারীরা ও নাইজেরীয়ায় *Aba* নারীরা অধিকারকে এ ধরণের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ভাষায় ব্যবহার করতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে উপনিবেশগুলো স্বাধীন হতে থাকলে উন্নয়ন পূর্বের ক্ষমতার সম্পর্ক বলবৎ রাখার একটি উপায় হিসাবে আর্বিভূত হয়। এসময় উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝানো হতো। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নই তখন নব্যস্বাধীন দেশসমূহের অধিকারের ধারণায় পরিণত হয়। প্রথম দিকে উন্নয়ন ও মানবাধিকারকে ভিন্ন ভাবা হতো। উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতেন অর্থনীতিবিদরা আর মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতেন আইনবিদ ও সমাজকর্মীরা। ঠান্ডা যুদ্ধের (cold war) কারণে ১৯৬৬ সালে ২টি সনদ সামনে আসে। সোভিয়েত নেতৃত্বে International Convention on Economic, Social and Cultural Rights আর USA এর নেতৃত্ব হয় The convention on civil and political rights। এই দুটি সনদের বক্তব্য প্রায় একই এবং দু'টি সনদই উন্নয়ন ও অধিকারের ধারণাকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। Social & cultural rights এর কথা এখানে বলা হলেও এ সময় বোঝানো হতো যে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে নিশ্চিত করে। উন্নয়ন সংস্থাগুলো এ সময় তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতা দূর করার নামে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় কি কি basic need[৩] প্রয়োজন তা সামনে তুলে ধরা হয় এবং এজন্য বৈদেশিক সাহায্য নিতে উপদেশ দেয়া হয়। অর্থাৎ এ সময় need base approach[৪] উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সাহায্য করার উপায় হিসাবে কাজ করে। অথচ এই রাষ্ট্রগুলোর কি প্রয়োজন তা ঠিক করতো দাতা দেশসমূহ। ১৯৮০ ও ৯০ এর দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা উপর থেকে চাপিয়ে দেবার অভিযোগে সমালোচিত হতে থাকে। দেখা গেল যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণা প্রয়োগ করতে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ আরো দরিদ্র হচ্ছে[৫]। তার প্রেক্ষিতে জনগণবান্ধব উন্নয়নের প্রসঙ্গ সামনে আসে। ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘ Declaration on the rights to development কে অনুমোদন করে। কিন্তু তা ঠান্ডা যুদ্ধের কারণে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এখানে অধিকারের ধারণার সাথে নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক যুক্ততাকে তুলে ধরা হয়। এ সময় থেকে অধিকারকে সামাজিক ভাবে দেখা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে The viena conference on human rights এ উন্নয়ন ও মানবাধিকারকে একসাথে যুক্ত করে দেখা যায়। এসময় বলা হয় কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় সামাজিক ও সংস্কৃতিক উন্নয়নও প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর দেয়া হয়। এর কারণ অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত সামাজিক, সংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি বিষয়গুলোকে উন্নয়ন ধারণার সাথে যুক্ত করা যায়; একই সাথে পূর্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যর্থতার দায়ও আড়াল করা যায়। এই প্রেক্ষিতে অমর্ত্য সেনের Development as freedom & UNDP এর Human Development Report (HDR) on human development

and human rights প্রকাশিত হয়। এর ফলে মানবাধিকার ও উন্নয়নের ধারণা একিভূত হয়। মানবাধিকার উন্নয়নে তখন অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে পড়ে উন্নয়ন বাস্তবায়নের একমাত্র উপায়। এখন জনগণ নিজেদের মুখ দিয়েই দাতাদের কথা বলে। এরই প্রেক্ষাপটে শিশু অধিকারের ধারণা নিয়ে ১৯৮৯ সালে UN convention on the rights of the child সামনে আসে।

শিশু অধিকারের ধারণাটি বৈশ্বিক মানবাধিকার ধারণা হতে উৎসরিত। মানবাধিকারের ধারণা যেমন পৃথিবীর সকল মানুষকে এক মনে করে তেমনি শিশু অধিকারের ধারণাও পৃথিবীর সকল শিশুকে সমরূপ মনে করে। শিশু অধিকারের ধারণাটির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। এই সনদ চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো হচ্ছে বৈষম্যহীনতা, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা, শিশুদের অধিকার সমুন্নত রাখায় পিতামাতার দায়িত্ব এবং শিশুর মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Theis, 2004)। বৈষম্যহীনতার আলোচনায় বলা হয় সকল শিশুর লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তা, গোত্র-বর্ণ, শারীরিক সমস্যা অথবা জন্মের ভিত্তিতে কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই সনদে প্রণীত অধিকার সমূহ ভোগের অধিকার রয়েছে। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার এই পর্যায়ে বলা হয় যে মা-বাবা, সংসদ, আদালত এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবেন। শিশু অধিকার সমুন্নত রাখায় পিতা-মাতার দায়িত্বতে বলা হয় শিশু অধিকার সনদে শিশুদের যে অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মা-বাবার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুর বয়স ও বড় হয়ে ওঠা অনুসারে তাকে পরিচর্যা করাই নিয়ম। মূলত এই নীতিতে এটাই তুলে ধরা হয়েছে যে কিভাবে মা-বাবা তাদের শিশুদের পরিচর্যার সময়, তাদের অধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিবে। শিশুর মাতা-পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বলা হয় নিজস্ব মতামত দেয়ার উপযোগী বয়সের শিশুদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করাই এই নীতির লক্ষ্য। শিশুর মতামত কতটা গুরুত্ব পাবে তা নির্ভর করবে শিশুর বয়স ও পরিপক্কতার উপর। ঘরে ও স্কুলে প্রতিদিন যেসব সিদ্ধান্ত মুখে মুখে নেয়া হয়, তার সকল ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য।

শিশুকে নিয়ে উন্নয়নকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ যেখানে সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি (White, 2002)। এই সনদের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে কেবল বয়সের ক্যাটাগরী (১৮ বছরের নীচে) দিয়ে শিশুদেরকে বিবেচনা করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না এই ধারণা ভ্রান্তিকর। প্রথমত- এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মডেল উপস্থাপন করা হয়, তাতে সকল সমাজের শিশুদের সমাজাতীয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা কিনা একটি পশ্চিমা আদর্শবাদী মডেল। এখানে শিশুর অধিকারকে বুঝতে গিয়ে অনুন্নত দেশসমূহ তথা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহ সবসময় তার নিজ প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে পশ্চিমা মডেলকেই অনুসরণ করে। দ্বিতীয়ত- এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুকে প্রেক্ষিত বিচ্যুত হিসাবে দেখা হয়েছে। এখানে শিশুকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে মনে করা হয় শিশু অধিকারের

সাথে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনীতি, শ্রেণী, লিঙ্গ বা প্রজন্মগত কোন সম্পর্ক নেই। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিচালিত উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রকল্পসমূহ শিশুর অধিকার বাস্তবায়নে প্রায়শ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৩. পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণায়ন

শিশুকে নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি উন্নয়ন সংস্থাতে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয়। শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে শিশুকে বিশেষ নাজুক গ্রুপ হিসেবে ধরে নিয়ে সমাজ-সংস্কৃতি থেকে আলাদা করে গবেষণা করার কথা বলা হয় তা উন্নয়ন সংস্থার জন্য কিছু সমস্যা তৈরি করে। মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তারা একটি প্রশ্নের সম্মুখিন হন বারবার, আর তা হচ্ছে- কেন শিশুকে আলাদা করে ভাবতে হবে? পরিবার, সমাজ ও সম্প্রদায়তো শিশুর মঙ্গলই চায়, তবে তার বাইরে কেন শিশুকে নিয়ে ভাবতে হবে? এ নিয়ে উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই হতাশা ও বিভ্রান্তি দূর করতেই পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি সামনে আসে। এর মূল কথা হচ্ছে শিশুকে পরিবারের বা সম্প্রদায়ের বাইরে নয় বরং একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে গবেষণার একক হিসেবে শিশুর পরিবর্তে তার পরিবারকে ধরা হয়। ভাবা হয় পরিারের উন্নয়ন হলে শিশুরও উন্নয়ন হবে। পরিবার এখানে কেবল Duty Bearer হিসেবেই কাজ করে না বরং তাকে ভাবা হয় Active Agent। তাই পরিবারের সদস্যদের শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও দায়িত্ববান করে তোলা হলো এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল উদ্দেশ্য। শিশুর পরিবর্তে পরিবারকে গবেষণার একক ভাবার কারণে শিশুর মধ্যে যে বৈচিত্রতা ও ভিন্নতা রয়েছে তা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্ব পায় বলে উন্নয়ন সংস্থাসমূহ মনে করে। একই সাথে এটি তাদের শিশুকে কেন্দ্র করে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ বুঝতে ও অন্যদের বোঝাতে সহজ করে তোলে। এক্ষেত্রে একটি উন্নয়ন সংস্থা VERC (Village Education Research Centre) এর কথা বলা যায়। VERC তাদের child sanitation rights programme এ প্রথমে শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করছিলো কিন্তু তা প্রয়োগে নানা সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীতে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই সমস্যাসমূহ দূর হয়েছে বলে তারা দাবি করে। এ সম্পর্কে সেখানকার একজন কর্মকর্তা বলেন-

> প্রথমে যখন আমাদের ট্রেইনিং এ বলা হয় শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে হবে, শিশুর জন্য আলাদা স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে তখন আমরা এর অর্থ বুঝতাম না। শিশুকে কেন তার সমাজ, বাবা-মা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। তার বাবা-মা তো তার ভালোই চায়। এই বিষয়টি যখন আমরা ফিল্ডে প্রয়োগ করতে গিয়েছি তখন আরো কিছু সমস্যার মাঝে পড়ি। মানুষকে বোঝানোই যেত না কেন শিশুর জন্য আলাদা লেট্রিন প্রয়োজন। এটা নিয়ে সবাই হাসাহাসিও করতো। সবাই মনে করতো আমরা ছেলেধরা বা অন্য কিছু। অফিসে এসে বললে আমাদের প্রজেক্ট ম্যনেজার বলতো- *এভাবেই কাজ করতে হবে, কেননা UNCRC তে এভাবেই বলা আছে। এর বাইরে আমাদের যাওয়ার সুযোগ নেই।*
>
> এরপর অর্জুন গুপ্ত নামক একজন ভদ্রলোক যিনি কিনা Save the Children (Finland) এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা, তিনি আমাদের ট্রেইনিং দিতে আসেন। তাকে সমস্যার কথা বললে

> তিনি একটি রাস্তা বলে দেন। তিনি বলেন ২টা পদ্ধতি আছে। একটা হচ্ছে শিশু অধিকার পদ্ধতি আরেকটি হচ্ছে শিশু কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিশু কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুকে সমাজ থেকে আলাদা নয়, সমাজের মধ্যেই তাকে চিন্তা করতে হবে। সমাজের উন্নয়ন চিন্তা করতে হবে কিন্তু শিশুকে প্রাধাণ্য দিয়ে। তার এই কথা যখন আমরা ফিল্ডে প্রয়োগ করি তখন দেখি কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। সবাইকে বোঝানো সম্ভব হয়। এরপর থেকে আমাদের প্রজেক্ট খুব সুন্দর ভাবে এগুচ্ছে।

বিষয়টি আরো পরিস্কার হয় আরেকটি উন্নয়ন সংস্থা Plan Bangladesh এর দিকে নজর দিলে। Planও শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একই রকম সমস্যায় পড়ে। এর পরিপ্রক্ষিতে তারা তাদের প্রজেক্টকে নতুনভাবে সাজায়। তারা এই প্রজেক্টের নাম দেয় CCCD(Child centered community development)।
তাদের এক কর্মকর্তার ভাষায়-

> আমরা অন্য এন.জি.ও এর মতো শিশুকে কমিউনিটি থেকে আলাদা করে দেখি না। আমরা কমিউনিটির উন্নয়নের কথা বলি। কমিউনিটির দারিদ্রতা, সমস্যা নিয়ে কাজ করি। আমাদের কাছে কমিউনিটিকে উন্নয়ন করতে হবে কিন্তু শিশু থাকবে কেন্দ্রে। কমিউনিটিতে শিশুর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ থাকে। তাই তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এভাবে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প ও সংশোধিত একটি পদ্ধতি হিসেবে উন্নয়ন সংস্থাতে আর্বিভূত হয়। এখানে দাবি করা হয় এটি শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গি হতে অধিকতর কার্যকর। এখানে ভাবা হয় বৈশ্বিক শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অসঙ্গতি রয়েছে তা এই স্থানিক পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দূর হয়ে যায়। একই সাথে এই পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর ও শিশু অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখবে বলে তারা মনে করে। নিম্নে উন্নয়ন সংস্থার দৃষ্টিতে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে কিছু ভিন্নতা উল্লেখ করা হলো-

টেবিল ঃ উন্নয়ন সংস্থার দৃষ্টিতে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে ভিন্নতা

পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি	শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গি
স্থানিক	বৈশ্বিক
শিশুকে সম্প্রদায়ের একটি অংশ মনে করা হয়	শিশু স্বতন্ত্র ক্যাটাগরি হিসেবে ধরা হয়
পরিবার, সমাজ ও সম্প্রদায়কে উন্নয়ন পলিসিতে যুক্ত করা হয়	পরিবার, সমাজ ও সম্প্রদায়কে কেবল অধিকার দাতা (Duty Bearer) হিসেবে গন্য করা হয়।
সহজবোধ্য ও কার্যকরী	দূর্বোধ্য ও অকার্যকর

সূত্রঃ নিজ মাঠকর্ম ২০১১-১২

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি কিন্তু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে না বরং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদকে প্রধান ও কেন্দ্রে রেখে কাজ করছে। VERC এর একজন কর্মকর্তার ভাষায়- *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ হচ্ছে আমাদের জন্য সংবিধান। এর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই।*

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ আবার স্থানিক প্রেক্ষাপটকে না বুঝে, পৃথিবীর সকল শিশুকে একই বাস্তবতায় একটি 'কল্পিত সম্প্রদায়'[৬] হিসেবে ধরে নিয়েছে (White, 2008)। যেখানে সমাজ- সংস্কৃতি ভেদে শিশুর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, আবার একই সংস্কৃতিতে সকল শিশু সমবাস্তবতায় থাকে না, সেখানে সকল শিশুকে একই মনে করা কেবল সমস্যাজনকই নয়, ভ্রান্তিকরও বটে। আবার বয়স দিয়ে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে যেভাবে বোঝা হয়েছে তাও সমস্যাজনক। কেননা সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে শিশুর এই জৈবিক বয়সের ধারনায়ণে ভিন্নতা রাখে। আর তাই পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুর যে স্থানিক বাস্তবতার কথা বলা হচ্ছে তা কেবল কাজের সুবিধার জন্য, আদতে বৈশ্বিক ধারনাই এখানে মূখ্য ভূমিকা রাখছে। কেননা পরিবার সমাজ, সম্প্রদায়ের কথা বলা হলেও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ তাকে এখানে মূখ্য। তাই পরিবার সমাজ, সম্প্রদায়ের কথাগুলো কেবল পূর্বতন ধারণাটিকেই নতুনভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বিষয়টিকে বোঝার জন্য Martin Hajer (1995) এর *Story Lines and Discourse Coalition* প্রত্যয় দুটি খুব উল্লেখযোগ্য। Hajer(1995) এর মতে, একটি ডিসকোর্স[৭] সমালোচনার মুখে পড়লে তার Story Lines বা গল্পটি সমস্যার মুখে পড়ে। তখন অন্য ডিসকোর্সের সাথে যুক্ত হয়ে গল্পটিকে গ্রহনযোগ্য করা হয়। এটি তখন কেবলমাত্র ঐ ডিসকোর্সের বোঝাপড়াই তৈরি করে না বরং ঐ ডিসকোর্সের গল্পটিকে শ্রবণ শুদ্ধও করে তোলে। এভাবেই নতুন একটি ডিসকোর্স পূর্বতন ডিসকোর্সের সাথে কোয়ালিশন ঘটে। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গিটি যখন সমালোচনার মুখে পড়ে তখন একটি নতুন Story Lines তৈরি করা হয় পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নামে, যা আদতে শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির কথাসমূহকেই সামনে তুলে ধরে।

৪.উন্নয়ন সংস্থাসমূহের টানাপোড়েন

উপরের আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে শিশুকে নিয়ে গবেষণার সীমাবদ্ধতা দূর করতে যে সমাধানের কথা বলে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি উন্নয়ন সংস্থাতে আবির্ভূত হয়েছিলো তা কেবলমাত্র আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তবে রূপ নেয় না। বাস্তবতাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজ ও সম্প্রদায়কে নিয়ে শিশুর যে উন্নয়নের কথা পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে, তা কেবলমাত্র বাহ্যিক আবরণ হিসেবেই কাজ করে, ভিতরে সেই শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গির মতই সকল প্রক্রিয়া কাজ করে। এর কারণ স্থানিক উন্নয়ন সংস্থা সমূহ বৈশ্বিক উন্নয়ন সংস্থার অর্থ ও পরামর্শে পরিচালিত হয়। বৈশ্বিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ পশ্চিমা আদর্শবাদী মডেলে শিশুকে তার প্রেক্ষিত বিচ্যুত করে বুঝতে চাচ্ছে। তাই দেখা যায় স্থানিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সমাজ-সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত করে শিশুর উন্নয়নের বিভিন্ন প্রোগ্রামের কথা বললেও রিপোর্ট লেখার

সময় তারা শিশুকে প্রেক্ষিত বিচ্যুত করে স্বতন্ত্র এজেন্ট হিসেবে ধরে নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে। এ বিষয়ে VERC এর একজন কর্মকর্তা বলেন-

> আমাদের হাত-পা বাঁধা, কিছু করার নেই। আমাদের গাইডে বলা আছে তথ্য সংগ্রহ ও প্রোগ্রাম ভালোভাবে পরিচালনার জন্য শিশুর পাশাপাশি তার বাবা-মা ও অভিভাবককে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু রিপোর্ট লেখার সময় আমাদের কেবল শিশুর কথা লিখতে বলা হয়। তার বাবা-মা এর কথা লেখার কোন জায়গা সেখানে নেই।

এ বিষয়ে VERC এর প্রোগ্রাম ম্যনেজারকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন তাদের জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুসারে চলতে হয়। নতুবা কোন প্রজেক্টের অর্থ আসবে না। তার ভাষায়-

> সারা পৃথিবীতে UNCRC অনুসারে শিশু অধিকারকে দেখা হয়। সবাই মনে করে সেটি অনুসারেই শিশুর ভালো হবে। আমরা যখন প্রোপোজাল (গবেষণা প্রস্তাবনা) দেই তখন UNCRC অনুসারেই দিতে হয়। নতুবা আমরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবো না। প্রোপোজাল এ পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নামে কিছু থাকে না, সেখানে শিশুর অধিকারের কথাই বলা হয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে সমস্যা হয় বলে আমরা শিশু কেন্দ্রিক কমিউনিটি উন্নয়নের কথা বলি। না হলে তো আমরা কাজ করতে পারবো না।

VERC এর এই কর্মকর্তার ভাষায় এটি স্পষ্ট যে তারা স্থানিক প্রেক্ষাপটে নয় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিশুকে বুঝতে চাচ্ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বোঝার জন্য তারা শিশুর মধ্যে যে ভিন্নতা ও বৈচিত্রতা রয়েছে তা আড়াল করে দেয়। সকল শিশু একই বাস্তবতায় বাস করে না, তাই তাদের ভালো-মন্দ একরকম হয় না। নিম্নে রুবেলের কেইস স্টাডির মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়-

> রুবেলের বয়স ১৩ বছর। বাবা মোঃ নজির আলী পেশায় রিক্সাচালক। মা রজিয়া বেগম একজন গৃহিনী। রুবেলের গ্রামের বাড়ী নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায়। হাতিয়া এমন একটি দ্বীপ যেখানে সড়ক পথে সারা বাংলাদেশের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। হাতিয়ার মানুষের একমাত্র অবলম্বন নৌপথ। পাশাপাশি হাতিয়া বাংলাদেশের অতি নদি ভাঙ্গন কবলিত একটি এলাকা। পরিবারে বাবা-মা সহ রুবেলরা ৭ জনের পরিবার। তার বাবা উত্তরাধিকার সুত্রে কিছু জমি-জামা পেয়েছিলেন কিন্তু নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে তারা জমিহারা হয়। তারা ভেবেছিলো নদীভাঙ্গন থেমে যাবে, কিন্তু তা হয়নি। নদীভাঙ্গনের কবলে পড়ে তারা ভিটে-বাড়ীও ছাড়া হয়। রুবেলের পরিবার নিঃস্ব হয়ে ঢাকা চলে আসে। রুবেলের বাবা প্রথমে ছোট-খাট ব্যবসা করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে রিক্সচালনার পেশা বেছে নেন। কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় রুবেলের বাবা পঙ্গুত্ব বরন করেন। এই অবস্থায় তার পরিবার বিপদে পড়ে যায়। তারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে ইসলামনগরে চলে আসে। তার মা বাসায় কাজ করে মাসে ১০০০ টাকা পায় কিন্তু তাতে তাদের পরিবার চলতে পারে না। এই অবস্থায় রুবেল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে রিক্সা চালনার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে তার মাসে ৫০০০ টাকার মতো আয় হয়। সে তার পুরো টাকাটিই তার মায়ের হাতে তুলে দেয়। সেই টাকা পরিবারের জন্য ব্যয় হয়। রুবেল জানায় তারা কোনদিনও ভাবেনি তাদের পরিবারের এমন দিন আসবে। পরিবারের বেচেঁ থাকার তাগিতে সে স্বেচ্ছায় এই পেশা গ্রহন করেছে। রুবেল

> জানায় এর পর কিছুলোক এসে পড়ালেখার কথা বলে। তার ভাষায়, *বাপ-মা এর লগে কথা কয়। কয় তারা টাকা-পয়সা ছাড়া পড়াইবো।* কিন্তু রুবেল তাতে রাজি হয়নি। তার কাছে তার পরিবারের জীবনধারন প্রথমে তারপর অন্যকিছু। তার ভাষায়, *পড়াশোনা কইরা কি হইতো, পেটে বাত (ভাত) তো আসতো না। রিক্সা চালাইয়া কোন রকম খাইয়া পইড়া বাইচ্চা (বেচেঁ) আছি।*

রুবেলের এই কেইসস্টাডিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তার আয়েই তাদের পরিবার চলছে। শুধু তাই নয় এই কেইসে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি শিশু প্রধান গৃহস্থালীর গল্প। কেননা শিশুই (রুবেল) এই পরিবারের প্রধান আয়কর্তা। যা কিনা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী অগ্রহনযোগ্য। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুশ্রম বন্ধের কথা বলা হয়। এখানে শিশুর যে ভিন্ন বাস্তবতা থাকতে পারে তা বোঝা হয়নি। রুবেলের প্রেক্ষিতে তার শিশুশ্রমে যুক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বরং এই শিশু শ্রমই তাদের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখছে। এক্ষেত্রে Olga Nieuwenhuys(1996*)* এর কাজটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তার *The paradox of child labor and anthropology* বলেন, উন্নয়ন সংস্থাসমূহ শিশুকে নিরাপরাধ (innocent) সত্তা হিসেবে বিবেচনা করতে গিয়ে শিশুর মাঝে যে এজেন্সি[৮] রয়েছে তাকে অস্বীকার করছে। তিনি বলেন, তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই শিশুর শ্রম তার পরিবার ও সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ও বিভিন্ন পলিসিতে যেভাবে শিশুকে উৎপাদন হতে দূরে রাখার কথা বলে তা উল্টো শিশুর নাজুকতাকে বাড়িয়ে দেয়। কারন এর ফলে শিশুর যে শ্রম মূল্য তা অগুরুত্বপূর্ণ ও সস্তা হিসেবে ধরা দেয়। যদি এই বিষয়টি আমরা উন্নয়ন সংস্থার গবেষণা পদ্ধতি দিয়ে বিবেচনা করি তাহলে দেখবো, শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই শিশু শ্রমকে খারাপ মনে করে তা বন্ধ করার কথা বলবে। অন্যদিকে পরিবারকন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রুবেলের পরিবারকে সহয়তার কথা বলবে কিন্তু আদতে গিয়ে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধেই কথা বলবে। কিন্তু এই শিশুশ্রম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশু ও তার পরিবারের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হতে পারে তা বোঝার পরিসর যেমন জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে নেই তেমনি নেই শিশু অধিকার কিংবা পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শিশুকে নিয়ে উন্নয়ন এজেন্ডার পদ্ধতিগত পরিবর্তন করেও যখন ফলাফল পাওয়া যায় না তখন তা স্থানীয় মানুষ এমনকি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছেও হতাশা ও বিভ্রান্তি তৈরি করে। Plan international এর একজন কর্মকর্তা উল্লেখ করেন শিশুদের মাঝে যে প্রজেক্টগুলো নেয়া হয় তা শিশুরাই জানে না। তার মতে অনেক শিশু তাদের সাথে কাজ করে কেবল অর্থের জন্য। তার ভাষায়-

> যে শিশুরা আমাদের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে, তারা প্রায় সবাই প্রোগ্রাম ডিজাইন বা প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানে না। মিটিংয়ে যে শিশুরা আসে তারা অংশগ্রহনের জন্য আসে না তারা আসে খাবারের জন্য। এন.জি.ও রা যখন শিশুদের মিটিং এর জন্য ডাকে তখন শিশুরা প্রশ্ন করে কত টাকা দেয়া হবে, কি খাবার দেয়া হবে ইত্যাদি। আলটিমেটলি গিয়ে ঐ ফ্যাসিলেটেটররা যা চায় তা দিয়েই রিপোর্ট হয়। শিশুর অংশগ্রহণ এখানে তেমন গুরুত্ব লাভ করে না।

আবার সমাজ-সংস্কৃতি না বুঝে এই প্রজেক্টগুলো এগুনোর কারণে কিছু সমস্যা তৈরি হয়। সকল সমাজেই কিছু সামাজিক মূল্যবোধ থাকে শিশু কি নিয়ে কাজ করবে আর কি নিয়ে কাজ করবে না। কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটহীন শিশুর ধারণা রেখে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয় তাতে স্থানিক মূল্যবোধের সাথে একধরনের টানাপোড়েন তৈরি হয়। এই বিষয়টি Plan international এর একজন কর্মকর্তা উল্লেখ করেন এভাবে-

> কিছু কিছু বিষয় আছে যেখানে শিশুদের নিয়ে কাজ করলে সমস্যা হয়। যেমন Reproductive health, Sanition বা AIDS and STD প্রজেক্ট। দেখা যায় যে শিশু, মানে যারা একটু বড় ১৫/১৬ বছরের, তাদেরকে নিয়ে যখন reproductive health এর কাজ করা হয় তখন এলাকার লোকজন তা ভালোভাবে দেখে না। তারা নানা প্রশ্ন করে যে কেন ছোট ছেলেমেয়েদের এগুলো শিখিয়ে নষ্ট করা হচ্ছে। আবার এমনও কিছু কেস আমরা পাইছি যেখানে যে ছেলেমেয়েরা reproductive health এর কাজ এর সাথে যুক্ত ছিলো তারা নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। এজন্য আমাদের কিছু মাঠকর্মীকে মাইরও খেতে হইছে। পরে আমাদের ওখান থেকে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

উপরোক্ত কথাগুলোর মাধ্যমে স্পষ্টতই উন্নয়ন সংস্থা সমূহের শিশুর উন্নয়ন এজেন্ডা নিয়ে টানাপোড়েনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। একদিকে তারা সমাজ-সম্প্রদায়কে যুক্ত করে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছে, অন্যদিকে আবার এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রেক্ষিত বিচ্যুত হওয়ার কারনে সমাজ-সংস্কৃতির সাথে টানাপোড়েন তৈরি করছে। এই টানাপোড়েনের কারনে শিশুকে নিয়ে অধিকাংশ উন্নয়ন এজেন্ডাসমূহ কেবল কাগজের দলিলই হয়ে থাকে বাস্তবতায় এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এই বিষয়টির বোধ স্বয়ং উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যেই রয়েছে। Plan international এর একজন কর্মকর্তা যেমন বলেন- *শিশুর ভালো-মন্দ তার বাবা-মাকেই দেখতে হবে। এন.জি.ও রা কিছু করতে পারবে না আর করে লাভও নেই*।

৫. উপসংহার

এই আলোচনায় শিশুর উন্নয়ন নিয়ে উন্নয়ন সংস্থাসমূহের নানা টানাপোড়েন সমূহ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুকে সমাজের নাজুক গ্রুপ হিসেবে ধরে নিয়ে তাকে উন্নয়ন এজেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ এক্টর করে তুলেছে উন্নয়ন সংস্থাসমূহ। এই প্রক্রিয়ায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। এই সনদ পৃথিবীর সকল শিশুকে একই বাস্তবতায় ধরে নিয়ে তাকে প্রেক্ষিত বিচ্যুত করে উন্নয়ন করার কথা বলে। বলা হয় শিশুদেরও প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো অধিকার রয়েছে। তাকে তার অধিকার দিতে হবে। এই অধিকার দেয়ার পদ্ধতি হিসেবে আসে শিশু অধিকার দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে শিশুকে মনে করা হয় অধিকার প্রাপক আর তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও এন.জি.ও রা থাকে অধিকার দাতা হিসেবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কাজ করতে গিয়ে কিছু সংকট তৈরি হয়। কেন শিশুকে তার পরিবার থেকে আলাদা করে উন্নয়ন করতে হবে তা অধিকাংশ মানুষের কাছে বোধগম্য হয় না। এই বিষয়টি বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ায় উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যেও হতাশা কাজ করে। এই হতাশা দূর করতেই আসে পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নামক একটি নতুন পদ্ধতি। এখানে বলা হয় কেবল হয় কেবল শিশু নয় সমগ্র

সমাজের উন্নয়ন করতে হবে কিন্তু শিশু থাকবে কেন্দ্রে। এখানে সমাজ ও সম্প্রদায়ের কথা বলা হলেও আদতে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদকেই এখানে মূখ্য মনে করা হয় ও সে অনুসারে রিপোর্ট লেখা হয়। তাই পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি একটি লোকদেখানো ও মাঠকর্মের সহায়ক হিসেবেই থেকে যায়, তা বাস্তবতায় রূপ নেয় না। একই সাথে বৈশ্বিক উন্নয়ন সংস্থার সাথে স্থানিক উন্নয়ন সংস্থা সমূহের দাতা-গ্রহিতার সম্পর্ক থাকায় পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আদতে গিয়ে শিশুকে প্রেক্ষিত বিচ্যুত ভাবেই চিন্তা করে প্রকল্প প্রণয়ন করে। আর তাই পরিবারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি শিশুর বাস্তবতা বুঝতে প্রায়শ ব্যর্থ, এটি কেবল বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডাকেই বাস্তবায়ন করে।

টীকা

১ এই প্রবন্ধটি ২০১১-২০১২ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থায়নে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে পরিচালিত একটি গবেষণাকর্মের আলোকে লেখা। গবেষণা কর্মটির শিরোনাম ছিলো *অধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বনাম শিশু কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ শিশুর বাস্তবতা অনুধাবনে উন্নয়ন এজন্সী সমূহের টানাপোড়েন।* এই গবেষণায় বাংলাদেশের বাস্তবতায় শিশুর উন্নয়নকে অনুধাবনে উন্নয়ন এজেন্সি সমূহের যে টানাপোড়েন কাজ করে তা বোঝার জন্য তথ্যদাতা হিসেবে শিশু, তার পরিবার ও উন্নয়নসংস্থার বিভিন্ন ব্যক্তিকে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। শিশু কোন সমরূপ সত্তা নয়। সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে শিশুর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আবার একই সংস্কৃতিতে ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স ও প্রাপ্ত বয়স্কের অবস্থান ভেদে শিশুর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তাই শিশুর ধারণায়নে বৈচিত্রতা বোঝার জন্য প্রেক্ষিত বিশ্লেষণকে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এছাড়া অকাঠামোকৃত সাক্ষাৎকার, আলাপচারিতা, FGD(Focus Group Discussioin), ন্যারেটিভ এপ্রোচ ও পর্যবেক্ষন কৌশলসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

২ বিস্তারিত দেখুন- রাশেদা আখতার (২০০৭), Kabeer, Nambissan, Subrahmanian (eds), *Child labour and the right to educaton in south asia: Needs versus Rights?* এর গ্রন্থ পর্যালোচনা, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা-১২, জা.বি।

৩ উনবিংশ শতাব্দির ৬০ এর দশকে এসে বিশ্ব ব্যংকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা সমালোচিত হতে থাকে। দেখা যাচ্ছে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু গ্রামের দরিদ্র মানুষ এর সুফল পাচ্ছে না। এরই প্রেক্ষাপটে basic need বা মৌলিক চাহিদার ধারনা আসে। এখানে বলা হয় প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) পূরণ হচ্ছে কিনা তার দিকে নজর রাখা হবে। এই ধারণার মাধ্যমে একভাবে পূর্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণাকেই নতুন ভাবে উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত দেখুন Brock, Cornwall and Gaventa (2001) *Power, Knowledge and political spaces in the framing of poverty policy*, IDS, Brighton, Sussex BN1 9RE.

৪ Need base approach মুলত মৌলিক চাহিদার কথাই বলে। এখানে বলা হয় ব্যক্তির যা প্রয়োজন সে অনুসারে উন্নয়ন পরিচালিত হবে। বিস্তারিত দেখুন Celestine Nyamu-Musembi and Andrea Cornwall (2004) *"What is the "rights-based approach" all about?*

Perspectives from international development agencies", IDS Working Paper 234, IDS, Brighton, Sussex BN1 9RE.

৫ ৭০ ও ৮০ এর দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা প্রবলভাবে সমালোচিত হতে থাকে। এসময় বলা হয় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠি আরো দরিদ্র হচ্ছে। অনেকে বেকার হচ্ছে, স্থানীয় জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এসময় ঐ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারনাকে পশ্চিমা আধিপত্যেরই নবরূপ হিসাবে সমালোচনা করা হয়। বিস্তারিত দেখুন Brock, Cornwll and Gaventa (2001) *Power, Knowledge and political spaces in the framing of poverty policy*, IDS, Brighton, Sussex BN1 9RE.

৬ কল্পিত সম্প্রদায়ের ধারনা দিয়েছেন বেনেডিক্ট এন্ডারসন। তার মতে মুদ্রণ পুঁজিবাদের বিকাশের কারনে অনেক মানুষের বোধকে এক করা সম্ভব হয়েছে। এই যে কেউ কাউকে না দেখে একই কল্পনা করছে একে তিনি বলেন কল্পিত সম্প্রদায়। বিস্তারিত দেখুন- Anderson, B. (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

৭ ডিসকোর্স হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের রাজনীতি করা। Michel Foucault তার *The Archæology of Knowledge* (1969) এ বলেন ডিসকোর্স চিন্তা করার কিছু উপায়কে নির্দিষ্ট করে দেয়। ঐ উপায়টি একটি মতাদর্শিক অবস্থান তুলে ধরার ক্ষেত্রে নিজেকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে। একই ভাবে চিন্তা করার অন্য উপায়গুলোর রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

৮ সাধারনভাবে এজেন্সী বলতে বোঝানো হয়, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কার্য সম্পাদনের সামর্থ্য এবং তার নিজস্ব ইচ্ছা পূরণের যোগ্যতাকে। এজেন্সী প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন Anthony Giddens. তার মতে, এজেন্সী সর্বজনবিদিত একটি প্রপঞ্চ, ব্যক্তি মাত্রই এজেন্সীর ধারক এবং বাহক কিন্তু ক্ষমতার পরিসরগত ভিন্নতা ব্যক্তির সামর্থ্যকে এবং কর্মক্ষমতাকে সীমিত করে। তাই কাঠামোগত ভিন্নতা সাপেক্ষে ব্যক্তির এজেন্সীর ভিন্নতাও লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন, সমাজ কাঠামোর কাঠামোকরণ (Structuration) প্রতিনিয়ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন নিয়ম ও চর্চার গঠন ও পুনঃগঠন করে থাকে। ব্যক্তি এই সকল কাঠামোর সাথে নিজেকে যুক্ত করে এবং এর মাধ্যমে তার নিজ নিজ লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়।

তথ্যপঞ্জী

Akhtar, Ahmed and Shaha (2008) *Analyzing the situation*, unpublished report for save the children (Sweeden-Denmark).

Akhtar, Rasheda (2006) Discourse of child participation: The case of save the children in *The Jahangirnagar Review*, part II: Social Science, Vol. XXX.

Brock, Cornwall and Gaventa (2001) *Power, Knowledge and political spaces in the framing of poverty policy*, IDS, Brighton, Sussex BN1 9RE.

Celestine Nyamu-Musembi and Andrea Cornwall (2004) *What is the "rights-based approach" all about? Perspectives from international development agencies"*, IDS Working Paper 234, IDS, Brighton, Sussex BN1 9RE.

Christensen, Pia and James, Allison (1999) *Research with Children - Perspectives and Practices,* sheffild university press, UK.

Denzin, Norman and Yvonna, Lincoln 1992 Ed., *Handbook of Qualitative Research*, Sage.

Foucault, Michel (1969) *The Archaeology of Knowledge*, Routledge: Trans. A. M. Sheridan Smith. London and New York.

Foucault, Michel (1980) *Power/ knowledge*, Selected Interviews and other Writings, Colin Gordon ed, Pantheon: New York.

Fraser, Nancy (1997) *Justice interrupts: Critical reflections on the post "socialist" condition,* Routledge: London.

Giddens, Anthony.1979. *Central Prolems in Social Theory : Action,Structure & contradiction in social analysis*. University of Califonia press. Berkeley.

Kabeer, N., Nambissan, G. and Subrahmanian, R. (eds.) (2003), *Child Labor and the Right to Education in South Asia: Needs versus Rights*, New Delhi: SAGE publications.

Nieuwenhuys, Olga (1996) *The paradox of child labor and anthropology,* Annaul Review 25:237-251

R. Rawnak Khan and Ahmed, Z (2006) The practice of childhood in slums in a londonivillage in sylhet in a paper presented at National Conference on *state, Violence and Rights: Perspectives from social science* organized by dept. of Anthropology, 22 and 24 april, Central auditoriam, Jahangirnagar University.

Sen, Amartya (1999) *Development as Freedom*, Oxford University Press: Oxford.

Stirrat and Henkel (1998) Participation as spiritual duty: The religious roots of the new development orthodoxy, paper presented on *PRA and Anthropology: Critiques and challenges*, in a workshop in IDS (19^{th} June), University of Sussex.

Theis, Joachim (2004) *Promoting Rights-based Approaches: Experiences and Ideas from Asia and the Pacific,* Save the Children Handbook.

White, Sarah C. (2002-a) From the politics of poverty to the politics of identity? Child rights and working children in Bangladesh, *Journal of international development*, 14 (6):725-725.

White, Sarah C. (2002-b) Being, Becoming and Relationship: Conceptual challenges of a child rights approach in Development, *Journal of international development*, 14 (8): 1095-1104.

White, Sarah C. (2008) Constructing child rights in Bangladesh: the global and the local, Journal of Anthropology, vol-13, Jahangirnagar University.

আখতার, রাশেদা (২০০৭), Kabeer, Nambissan, Subrahmanian (eds), *Child labour and the right to educaton in south asia: Needs versus Rights?* এর গ্রন্থ পর্যালোচনা, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা-১২, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।